ISSN 2227-1635
বাঙলা সাহিত্যিকী ৭ম সংখ্যা, আশ্বিন ১৪২৯

দ্বি-শতবর্ষের আলোয় বিদ্যাসাগর

বেতাল পঞ্চবিংশতি এবং *আখ্যানমঞ্জরী*র প্রাসঙ্গিকতা

*ড. আ. ন. ম. ফজলুল হক

সারসংক্ষেপ: ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাঙালি জীবনে চিন্তা-জাগানিয়া ব্যক্তিত্ব। তিনি জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সৃষ্টিতে নিজের প্রভাব প্রতিষ্ঠা করতে সমর্থ হয়েছিলেন; জনসমাজের রুচি-বিষয়ে প্রাতিস্বিক কল্পনা ও পরিকল্পনার এক অকল্পনীয় যোগসাজস ও সমন্বয় ঘটিয়ে ভারতে বিপ্লব সাধন করেছিলেন। তাঁর চিন্তা ও দর্শন, সমকালে এবং উত্তরকালে, বাঙালির জন্য এক বিরাট আশীর্বাদ হয়ে দাঁড়ায়। এই মনীষীর রচনা বাঙালি সমাজে যে ব্যাপক পরিবর্তন ও রূপান্তরে দৃষ্টান্তমূলক ভূমিকা রাখে, তা তাঁর জন্মের দ্বি-শতবর্ষ পরেও উজ্জ্বল আলোয় দেদীপ্যমান। বর্তমানে তাঁর *বেতাল পঞ্চবিংশতি* এবং *আখ্যানমঞ্জরী*র প্রাসঙ্গিকতা এই নিবন্ধের প্রধান বিষয়। বিদ্যাসাগর এই দুটি গ্রন্থে সমাজ-পরিসর, সমাজ-রূপান্তর, মানুষের সামাজিক অবস্থা ও অবস্থান সম্বন্ধে যেসব চিন্তার বহিঃপ্রকাশ ঘটিয়েছেন, এতকাল পরেও বোধহয়, তার প্রাসঙ্গিকতা ফুরোয়নি।

ভূমিকা

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর (জন্ম : ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০; মৃত্যু : ২৯ জুলাই ১৮৯১) ছিলেন বাঙালির বিবেক। দরিদ্র, অশিক্ষিত, কু-সংস্কার-নিমগ্ন একটি জাতিকে শিক্ষায়, সচেতনতায়, ঔচিত্যবোধে জাগিয়ে তুলতে, সামাজিকভাবে সেই পিছিয়ে-পড়া মানুষগুলোকে আধুনিক বিশ্বে অন্তত খানিকটা যোগ্য করে তুলতে বিদ্যাসাগরের চিন্তা-কল্পনা ও পরিকল্পনার কোনো সীমা-পরিসীমা ছিল না। তাঁর সমকালের বাঙালি সমাজকে আলোর পথে আনতে তিনি যে শ্রম বিনিয়োগ করেছেন, তাঁর সেই কাজের আদর্শ এবং ফল, আমরা প্রায় দুই শতাব্দি পরেও পরম শ্রদ্ধায় মাথায় করে নিয়ে আছি। বিজ্ঞান, প্রযুক্তি, মানুষের প্রয়োজন ও জিজ্ঞাসার বিচিত্র পরিবর্তন হলেও, আজও কিন্তু বিদ্যাসাগর বাঙালি সমাজে, বাঙালির শিক্ষার ভুবনে, বাঙালির চিন্তার বিবর্তন ও বিকাশে এবং মানবিক সমাজ-কাঠামো গড়তে খুব প্রাসঙ্গিক এক নাম। তাঁর সেই বিপুল ভাবনার প্রাসঙ্গিকতা, তাঁর দ্বি-শততম জন্মবর্ষের আলোয় আমরা নতুন করে অনুভব করতে চাই। সমাজ-রূপান্তরের এই কারিগরের কল্পনার ব্যাপ্তি আর বিশালতাকে খানিকটা স্পর্শ করতে পারলে বাঙালি সমাজে সৃষ্টি হতে পারে নতুন নতুন চেতনার বারান্দা ও উঠোন।

প্রাজ্ঞ সমাজচিন্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের জ্ঞান যেমন বাঙালিকে বহুদূর এগিয়ে যেতে সহায়তা করেছে, তেমনই তাঁর কাণ্ডজ্ঞানও আমাদেরকে বারবার ভাবনার ভুবনে ডুবিয়ে রাখে– নতুন নতুন কল্পনার ও চিন্তার পাঠ নিতে অনুপ্রেরণা যোগায়। 'বলা যেতে পারে, জ্ঞানী হিসাবে তাঁর পরিসর সুবিস্তৃত হয়নি। ঈশ্বরচন্দ্র তাঁর জ্ঞানের চেয়ে কাণ্ডজ্ঞানে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, শিক্ষাবিস্তার থেকে সমাজসংস্কার সবেতেই সেই কাণ্ডজ্ঞানের পরিচয় বর্তমান।'[১] আমরা জানি, 'শুধু স্ত্রী শিক্ষাই নয়, সমাজের সকল স্তরের মানুষকে বিদ্যাসাগর

* সহযোগী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়, বাংলাদেশ

শিক্ষার আলো দেখাতে চেয়েছিলেন।'[২] প্রসঙ্গত, রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটি মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে–

> অন্যান্য প্রতিভায় যেমন 'ওরিজিন্যালিটি' অর্থাৎ অনন্যতন্ত্রতা প্রকাশ পায়, মহচ্চরিত্রবিকাশেও সেই অনন্যতন্ত্রতার প্রয়োজন হয়। অনেকে বিদ্যাসাগরের অনন্যতন্ত্র প্রতিভা ছিল না বলিয়া আভাস দিয়া থাকেন; তাঁহারা জানেন অনন্যতন্ত্রত্ব কেবল সাহিত্যে এবং শিল্পে, বিজ্ঞানে এবং দর্শনেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। বিদ্যাসাগর এই অকৃতকীর্তি অকিঞ্চিতকর বঙ্গ সমাজের মধ্যে নিজের চরিত্রকে মনুষ্যত্বের আদর্শরূপে প্রস্ফুট করিয়া যে এক অসামান্য অনন্যতন্ত্রত্ব প্রকাশ করিয়াছেন তাহা বাংলার ইতিহাসে অতিশয় বিরল।... মাঝে মাঝে বিধাতার নিয়মের এরূপ আশ্চর্য ব্যতিক্রম হয় কেন, বিশ্বকর্মা যেখানে চার কোটি বাঙালি নির্মাণ করিতেছিলেন সেখানে হঠাৎ দু-একজন মানুষ গড়িয়া বসেন কেন, তাহা বলা কঠিন।[৩]

ভারতের প্রখ্যাত রাজনীতিবিদ মহাত্মা গান্ধী সমাজচিন্তক ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর সম্বন্ধে আগ্রহী ছিলেন। তাঁর জীবনদর্শন ও জীবনাচার বিষয়ে তাঁর মনোযোগের কথা আমরা জানতে পারি। বিদ্যাসাগরের জীবনবোধ সম্পর্কে তিনি মন্তব্য করতেও ভোলেননি। দেখে নেওয়া যাক, কী বলেছিলেন এই মহাত্মা–

> তাঁর নিজের জীবন অত্যন্ত সাদাসিধা ছিল। অঙ্গে মোটা ধুতি, মোটা চাদর এবং পায়ে সাধারণ চটি, এই ছিল ওনার পোশাক। ঐ পোশাকে উনি গভর্নরের সঙ্গে দেখা করতেন ও ঐ পোশাকেই গরীবদের অভ্যর্থনা জানাতেন। ঐ ব্যক্তি সত্যিকারের ফকির, সন্ন্যাসী অথবা যোগী ছিলেন। ওঁর জীবন পর্যালোচনা করে আমরা শিক্ষা গ্রহণ করতে পারি।[৪]

– এই যে বিদ্যাসাগর, কী ছিল তাঁর চিন্তার কেন্দ্রস্থল? কী-ই-বা করতে চেয়েছিলেন তিনি? সম্ভবত মানুষের সুখ ও শান্তি ছিল তাঁর ভাবনার কেন্দ্রে। আর তিনি বোধকরি বাঙালি সমাজকে একটি কল্যাণ-সমাজে রূপান্তরিত করতে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়েছিলেন ভেতরে ভেতরে। চেতনার গভীরের সেই কল্পনা-আলোড়নই তাঁকে সমকালে বিদ্যাসাগর বানিয়েছে এবং আজকের বাংলাদেশ পর্যন্ত বিস্তৃত করেছে তাঁকে এবং তাঁর রচনাবলিকে।

রেনেসাঁস-মানব বিদ্যাসাগরের প্রধান বৈশিষ্ট্য বহুমাত্রিকতা। ইহজাগতিকতা, যুক্তিবাদী শিক্ষা, বিজ্ঞানমনস্কতা ও নারীশিক্ষার প্রসার, নতুন গদ্যরীতি নির্মাণ, সমাজ-সংস্কার, বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, পাঠ্যসূচি থেকে অলৌকিকতা দূরীকরণ, চারিত্রিক দৃঢ়তা, মানবমুখিনতা প্রভৃতি আধুনিক ইউরোপীয় রেনেসাঁসকে বাঙালি মননের সাথে মিশিয়ে দেওয়ার এক অকল্পনীয় শক্তি নিয়ে যেন আবির্ভূত হয়েছিলেন তিনি।

বেতাল পঞ্চবিংশতি: বিষয়-ভাবনা এবং বর্তমানে প্রাসঙ্গিকতা

হিন্দি *বৈতালপচীসী* নামক গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের *বেতাল পঞ্চবিংশতি*[৫] (১৮৪৭)। এটি তাঁর প্রথম গ্রন্থ।[৬] ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের পাঠ্য *হিতোপদেশ*-এর পরিবর্তে সিলেবাসে অন্তর্ভুক্ত করার জন্য তৎকালীন অধ্যক্ষ মেজর জি. টি. মার্শাল-এর নির্দেশে বইটি লেখেন বিদ্যাসাগর। উজ্জয়িনী নগরের রাজা গর্দ্ধব সেনের পুত্র বিক্রমাদিত্য প্রজার প্রকৃত অবস্থা দেখার প্রত্যয়ে এবং দেশসেবার ব্রত হয়ে অনুজ ভর্তৃহরিকে রাজ্য-শাসনের ভার প্রদান করে গৃহত্যাগ করার কাহিনির মধ্য দিয়ে গ্রন্থটির উপাখ্যানের যাত্রারম্ভ। দেবপ্রদত্ত একটি 'অমরফল' প্রাপ্তি ও নানা হাত বদলের ঘটনার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছে বক্তার ভাবনার ফল। ফলটি দরিদ্র

ব্রাহ্মণ, রাজা ভর্তৃহরি, রাজার স্ত্রী, নগরপাল, তার বারাঙ্গনা অতঃপর পুনরায় রাজা ভর্তৃহরির হাতে আসার মাধ্যমে এখানে মানুষের জীবনচক্র, নারী-পুরুষের সম্পর্ক, জীবনবোধ, ধর্ম-ভাবনা প্রভৃতি বিচিত্র বিষয়ে চিন্তার অবতারণা করেছেন লেখক।

> ১৮৪৭ সালে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর স্থাপন করেছিলেন সংস্কৃত প্রেস ডিপজিটরি নামে একটি বইয়ের দোকান। ওই বছরই এপ্রিল মাসে প্রকাশিত হয় হিন্দি 'বেতাল পচ্চিসি' অবলম্বনে লেখা তাঁর বই *বেতাল পঞ্চবিংশতি*। প্রথম বিরামচিহ্নের সফল ব্যবহার করা হয় এই গ্রন্থে। বন্ধু মদনমোহন তর্কালঙ্কারের সঙ্গে অংশীদারত্বের ভিত্তিতে তিনি 'সংস্কৃত যন্ত্র' নামে একটি ছাপাখানাও স্থাপন করেছিলেন।[৭]

মাইকেল মধুসূদন লিখেছেন:

> বিদ্যার সাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
> করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
> দীন যে, দীনের বন্ধু!– উজ্জ্বল জগতে
> হিমাদ্রির হেমকান্তি অম্লান কিরণে।[৮]

রাজা, নগরপিতা এবং সন্ন্যাসী– এই ৩টি চরিত্রকে আশ্রয় করে কাহিনিকার নির্মাণ করেছেন মানব-জীবনের এক বাস্তব-অতিবাস্তব আলেখ্য। সমাজ-নিরীক্ষণ ও নীতিশিক্ষার মোড়কে মূলত যাপিত জীবনের পাঠই পাওয়া যায় এখানে। ব্রাহ্মণের স্ত্রীর জীবন-ভাবনা থেকে খানিকটা উল্লেখ করা যেতে পারে– 'অমর হইয়া আর কতকাল যন্ত্রণা ভোগ করিবে। তুমি, কি সুখে, অমর হইবার অভিলাষ কর, বুঝিতে পারিতেছি না।'[৯] অমরফল বহু হাত ঘুরে রাজার হাতে এলে তার অনুভব– 'সংসার অতি অকিঞ্চিৎকর, ইহাতে সুখের লেশমাত্র নাই। অতএব, বৃথা মায়ায় মুগ্ধ হইয়া, আর ইহাতে লিপ্ত থাকা কোনক্রমে, শ্রেয়স্কর নহে। অতএব, সংসার যাত্রায় বিসর্জন দিয়া, অরণ্যে গিয়া, জগদ্বীশ্বরের আরাধনায় প্রবৃত্ত হই।'[১০] – রাজার হতাশা, মানুষের প্রতি অবিশ্বাস আর সন্ন্যাসপনা প্রকাশ পায় এই কথার মধ্য দিয়ে।

উপাখ্যানের কোনো এক পর্যায়ে দেবরাজ ইন্দ্র প্রেরিত নগর রক্ষক যক্ষ (প্রেরিত পুরুষ, মহামানব বা নবী-রসুলের মতো কি!) রাজা বিক্রমাদিত্যকে 'জীবন-সংক্রান্ত গূঢ় বৃত্তান্ত' বললেন– যা কি-না পূর্ণাঙ্গ জীবন-ব্যবস্থা পবিত্র ধর্মগ্রন্থের অনুরূপ-প্রায়। ভোগবতী নগরের নরপতি চন্দ্রভানুকে বারবণিতা বললেন– 'আজ্ঞা পাইলে, আমি, ওই তপস্বীর ঔরসে পুত্র জন্মাইয়া, ঐ পুত্র তাহার স্কন্ধে দিয়া, আপনকার সভায় আনিতে পারি।'[১১] অতঃপর বারবণিতা ও সন্ন্যাসী 'নিরন্তর কেবল বিষয়সাধনায় কালহরণ' না করে তীর্থে যাবার তাড়না বোধ করে। তীর্থে যাওয়ার নাম করে বারবণিতা সন্ন্যাসীকে রাজার সভায় হাজির করে।– নারীর পক্ষে যে পুরুষকে টানিয়া নিচে নামানো সম্ভব, তা গল্পকার বুঝিয়ে দিয়েছেন কৌশলে। (আদি মানব আদমকেও বিবি হাওয়ার প্রলোভনে পড়তে হয়েছিল; কথিত গন্ধম ফল খেলে তাকে মর্ত্যে আসতে হয়েছিল)। বারবণিতার সাফল্যে রাজা বললেন– 'বুদ্ধিমতী বারবণিতা চির শুষ্ক নীরস তরুকে পল্লবিত এবং পুষ্পে ও ফলে সুশোভিত করিয়াছে।'[১২] অবশ্য সন্ন্যাসী শিক্ষা গ্রহণ করে, পরাজয়ের গ্লানি থেকে বাঁচার জন্য, নিজেকে রক্ষা করার জন্য, অতঃপর– 'অধিকতর মনোযোগ ও অধ্যাবসায় সহকারে যোগ সাধন করিতে লাগিলেন এবং কিয়ৎকাল পরে ঐ নরেশ্বরের মৃত্যু সাধন করিয়া, কৃতকার্য্য হইলেন।'[১৩] – বর্তমান অংশের পাঠ-পর্যালোচনা

এরূপ– যদি কেউ নিজের ভুল ধরতে পারে, এবং পুনরায় চেষ্টা চালায়, তাহলে তার লক্ষ্যে পৌঁছুতে অসুবিধা হয় না। চন্দ্রভানুর বেতাল হওয়ার খবর শুনে, 'রাজা বিক্রমাদিত্য, রাজ-নীতির অনুবর্তী হইয়া, রাজ্যশাসন ও প্রজাপালন করিতে লাগিলেন।'[১৪] –এই উপাখ্যানাংশে রাজার প্রশাসনযন্ত্র পরিচালনার আদর্শ ও দীক্ষা সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। দায়িত্ব পালন এবং প্রজা-সাধারণ বা জনগণের সেবাই যে রাজার বা রাষ্ট্রপ্রধানের কর্তব্য, তা পাঠককে জানান দিচ্ছেন বিদ্যাসাগর।

রাজাকে যখন সন্ন্যাসী 'অমূল্য রত্ন' উপহার দিতে থাকলেন, তখন রাজা মণিকারের (মণিকার: যিনি মণি-মুক্তার স্বরূপ নির্ণয় করেন) সহায়তা নেন। মণিকারকে তিনি রত্ন পরীক্ষার দায়িত্ব অর্পণ করেন। সে-সময়কার কথোপকথন, মণিকারকে কসম করানোর মতো–

> রাজা: 'এই অসার সংসারে ধর্ম্মই সার পদার্থ'
> মণিকার: 'ধর্ম্ম রক্ষা করিলে, সকল বিষয়ের রক্ষা হয়; ধর্ম্ম লোপ করিলে সকল বিষয়ের লোপ হয়।'[১৫]

বেতাল রাজাকে বলছে, যখন সে ভাদ্রচতুর্দশকৃষ্ণরাত্রিতে শ্মশান থেকে শবদেহ নিয়ে ফিরছে সন্ন্যাসীর কাছে– 'মূঢ়, নির্ব্বোধ ও অলসেরা কেবল নিদ্রায়, আলস্যে ও কলহে কালহরণ করে; কিন্তু বুদ্ধিমান চতুর, পণ্ডিত ব্যক্তিরা, সদা সদালাপ, শাস্ত্রচিন্তা ও সৎকর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা আনন্দে কালযাপন করিয়া থাকেন।'[১৬] এই উপাখ্যানে আছে– রাজা, রাণী, নগর, ব্রাহ্মণ, বনবাস–সাধনা ও সন্ন্যাস; যেন মসজিদে রোজার সময়ে এতেকাফে বসা কোনো সাধক-মুসলিম! এখানে চিত্রিত খড়্গপ্রহারে মস্তকচ্ছেদ সৌদি আরবে প্রচলিত শিরোচ্ছেদ কি? তাহলে, ধর্ম, নীতিশিক্ষা– প্রভৃতি যে মানুষের জীবনে খুব গুরুত্বপূর্ণ কিছু, তা-ই বোধকরি *বেতাল পঞ্চবিংশতি* গ্রন্থের অন্যতম প্রতিপাদ্য। তবে, প্রধান প্রতিপাদ্য হলো– 'অখণ্ড ভূমণ্ডলে অবিচল সাম্রাজ্য স্থাপন।'[১৭] বর্তমানে আমেরিকা, পূর্বে ইংল্যান্ড এবং ভাবীকালের ভাবনায় চীন যা যা করছে, তার সবই হলো এই প্রতিপাদ্যের অনুকূলের বিষয়-আশয়। সাম্রাজ্য-বিস্তারই এদের লক্ষ্য; মানুষের শান্তি এদের আরাধ্য নয়। বিদ্যাসাগর তাঁর সমকালকে যেভাবে দেখেছেন, সেই সমাজ তাঁর কাছে যেভাবে ধরা দিয়েছে, বর্তমান বিশ্ব তা থেকে মানবিক-ভাবনায় খুব বেশি অগ্রসর হতে পেরেছে বলে মনে হয় না। দেশে দেশে আজও আগ্রাসনে ছবি ভেসে বেড়ায়; দিকে দিকে এখনও শক্তিশালীদের দৌরাত্ম্য দৃশ্যমান।

এই গ্রন্থে ২৫তম কাহিনিতে, নারীর প্রতি পুরুষের মোহ, নারী-পুরুষের সামাজিক সম্পর্কের অব্যাখ্যেয় রূপ, সম্পর্কের অস্পষ্টতা বা লেজে-গোবরে অবস্থার পরিচয় পাওয়া যায়। ২৪তম কাহিনিতে আছে ভাতপাগল আর ঘুমকাতুরে বাঙালির পরিচয়। ভোজনবিলাসী আর শয়নবিলাসী চরিত্র দুটির মাধ্যমে হাজার বছরের বাঙালির এই বিশেষ বৈশিষ্ট্য ও প্রবণতাই প্রকাশ পায় মাত্র। প্রতিটি পাঠে একটি কাহিনি বা গল্পের অবতারণা এবং শেষে প্রশ্নের মাধ্যমে নীতিশিক্ষা ও বুদ্ধি-পরীক্ষার কৌশলে মানব-জীবন এবং বিশেষত ভারতবর্ষের সামাজিক-ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক সত্য প্রকাশ করেছেন লেখক। তাঁর বিবৃত কাহিনিতে ভারতে যক্ষের প্রবেশ বা আবির্ভাবও কি বিশেষ আরব রাজ্যে প্রেরিত-পুরুষদের আগমনকে নির্দেশ বা ইঙ্গিত করে না? আমরা জানি, বনভন্তের বনবাসের বাসনা ও চেষ্টায় আছে গৌতম বুদ্ধের ধর্ম-সাধনার রীতি-নীতি। বনবাসে থাকা,

সংসারধর্মে আস্থাহীনতা– এই সবকিছুই কি *বেতাল পঞ্চবিংশতি*র কাহিনি, জীবনাচার, অভিজ্ঞতা, শিক্ষা ও লক্ষ্যকে নির্দেশ করে না– অলক্ষ্যে বা পরোক্ষভাবে হলেও?

আখ্যানমঞ্জরী: বিষয়-ভাবনা এবং বর্তমানে প্রাসঙ্গিকতা

বিদ্যাসাগরের *আখ্যানমঞ্জরী* (নভেম্বর ১৮৬৩) সমকালের সমাজ-পরিপ্রেক্ষিতে একধরনের সংবাদ-ভাষ্য। প্রতিদিনের মানুষের আচরণীয়কে তিনি গল্পের মোড়কে প্রকাশ করেছেন। 'কতিপয় ইংরেজী পুস্তক অবলম্বনে সঙ্কলিত' আখ্যানমঞ্জরীও শিক্ষার্থীদের জন্য লেখা। তবে আখ্যান-নির্বাচনে তাঁর বিবেক ভারতীয় জীবনাদর্শের অনুগত। গ্রন্থটির রচনাগুলো ব্যক্তিগত ও পারিবারিক দায়িত্ব ও কর্তব্য-সম্বন্ধীয়। এখানে পাওয়া যাবে সদাচার ও সজ্জীবনের বিচিত্র পাঠ। সংকলিত আখ্যানগুলোর নির্বাচনে তিনি বিশেষভাবে ভারতের বাঙালি-সমাজের চাহিদা ও বিবেককে বিবেচনায় রেখেছেন। শত শত বছর ধরে বাঙালি-সমাজে প্রচলিত উপদেশবাণীগুলোর প্রতিফলন দেখা যায় এখানে। মূলত উপলব্ধিজ্ঞানে পরিশুদ্ধ হওয়ার বাণী প্রচার করেছেন তিনি। নীতি-প্রচারক বিদ্যাসাগরের *আখ্যানমঞ্জরী*র বিষয়-ভাবনাকে আমরা নিম্নরূপভাবে বিন্যস্ত করতে পারি–

১। স্বার্থকে, বিদ্বেষকে, ক্রোধকে দমন করো;
২। নিজের সম্পদ অপরের উপকারে দান করো;
৩। পীড়িতকে, দুর্ভাগাকে দয়া করো, সেবা করো।

এই গ্রন্থে বিদ্যাসাগর জাগতিক জ্ঞান-অর্জনে যেমন পাশ্চাত্য গল্প-উপদেশের সমাবেশ ঘটিয়েছেন, তেমনই জীবননীতির আদর্শ অনুধাবনে প্রাচ্যের ঋষিবাক্যের আশ্রয় নিয়েছেন। তিনটি পর্বে তিনি ইউরোপ-আমেরিকা-মধ্যপ্রাচ্য-প্রাচ্যকে পাঠকের সামনে হাজির করেছেন। কাহিনির চরিত্র হিসেবে কোনো রাজ্যের সম্রাট– ডিউককে যেমন পাই, তেমনই পাওয়া যায় কৃষক, বিপন্ন-দরিদ্র মানুষ, শিশু-কিশোর, নারী, শিকারি, ডাক্তারসহ নানা পেশা ও বৈশিষ্ট্যের প্রতিনিধি। এগুলো মূলত নীতিশিক্ষার প্রসঙ্গ ও পাঠ। নিবন্ধগুলোতে শিরোনামের কিছু পুরনাবৃত্তি আছে বটে; তবে বিষয়ের খাতিরে সে-অসমন্বয়-স্বভাব ক্ষমাযোগ্য। এই উপসম্পাদকীয় ধরনের মন্তব্য বা মুক্তকথা বা খোলাকলাম আমাদের সামনে এক বিপুল জিজ্ঞাসা ও সমস্যা মীমাংসার পথ বাতলে দেয়। এখানে আমরা যেন বর্তমানের এক অভিভাবকীয় কলামিস্টকেই খুঁজে পাই। সমাজ-সংস্কারে বিদ্যাসাগরের এই উপাখ্যানগুলো সমকালে যেমন তাৎপর্যপূর্ণ রচনা হিশেবে পাঠক মহলে সমাদৃত ছিল, এতোদিন পরে, আজও তা সমান গুরুত্বপূর্ণ।

প্রথমভাগের মন্তব্য-ভাষ্যের উল্লেখযোগ্য শিরোনাম হলো– 'প্রত্যুপকার', 'মাতৃভক্তি', 'পিতৃভক্তি', 'ভ্রাতৃস্নেহ', 'লোভসংবরণ', 'গুরুভক্তি', 'ধর্মভীরুতা', 'অপত্যস্নেহ', 'ধর্মপরায়ণতা', 'নিঃস্বার্থ পরোপকার', 'আতিথেয়তা;, 'প্রভুভক্তি ও দানশীলতা', 'সাধুতার পুরস্কার', 'পরের প্রাণ রক্ষার্থে প্রাণদান', 'নিস্পৃহতা', 'রাজকীয় বদান্যতা', 'বর্বরজাতির সৌজন্য', 'ভ্রাতৃবিয়োগ', 'ন্যায়পরায়ণতা' প্রভৃতি। আজকের সমাজে কলামিস্টরা চিন্তা-প্রকাশের মধ্য দিয়ে সমাজ-রূপান্তরে যে ভূমিকা রেখে চলেছেন, তারই পূর্বাভাস যদি ভাবি বিদ্যাসাগরের এইসব রচনাকে, তাহলে কিছুমাত্র ভুল হবে না। এবং সমকালকে বিবেচ্য

রেখেই আমরা বলতে পারি যে, বর্তমান প্রজন্মের বাঙালি সমাজে বিদ্যাসাগরের ওইসব কলামজাতীয় রচনা পুনর্মুদ্রণযোগ্য।

কী পাওয়া যায় বিদ্যাসাগরের *আখ্যানমঞ্জরী*তে? জীবনের কাহিনি? না-কি জীবনের সাজানোর উপাদান? প্রথমে তাঁর কিছু রচনা-পাঠ-পর্যালোচনা থেকে জানার চেষ্টা করা যেতে পারে–

এ কথা ঠিক যে, উপকারীর উপকার স্বীকার করা এবং তার প্রতি-উপকার করার সুযোগ সবাই পায় না। যারা তা লাভ করেন, তারা সৌভাগ্যবান। বিদ্যাসাগর, 'প্রত্যুপকার' কলামে এমনই এক ঘটনার অবতারণা করেন, উপকারের প্রতিদান দিতে পারা এক ব্যক্তির স্বীকারোক্তিমূলক অনুভূতি প্রকাশ করেছেন এভাবে– 'আমি যে কৃতজ্ঞতা দেখাইবার অবসর পাইলাম, তাহাতেই চরিতার্থ হইয়াছি, ও আশার অতিরিক্ত পুরস্কার পাইয়াছি; আমার অন্য পুরস্কারের প্রয়োজন নাই।'[১৮] দরিদ্র এই লোকটি পা ভেঙে পঙ্গু অবস্থায় যখন বিপন্ন ছিল, তখন যে অভিজাত মানুষটি সহায়তা করেছিলেন, একদিন তার বিপদে– যখন তিনি ঘোড়াসহ নদীতে পড়ে গিয়েছিলেন, তখন তাকে উদ্ধার করেন তিনি। বিনিময়ে তাকে পুরস্কার দিতে চাইলে, তাকে চিনতে পেরে লোকটি উপরিউক্ত জবাব দেয়।

মাতৃভক্তি রচনায় এক সুবোধ কিশোরের জীবন-দর্শন ও মায়ের প্রতি দায়িত্ববোধ প্রতিফলিত হয়েছে। বালক সম্বন্ধে লেখক বলছেন– 'এই বালক এরূপ সুবোধ ও মাতৃভক্ত না হইলে, বৃদ্ধার দুঃখের অবধি থাকিত না। ফলতঃ অল্পবয়স্ক বালকের এরূপ বুদ্ধি, এরূপ বিবেচনা, এরূপ আচরণ, সচরাচর নয়নগোচর হয় না।'[১৯] 'অপত্যস্নেহ'তে আছে সন্তানের প্রতি মায়ের অকৃত্রিম মমতার কথা। বাড়িতে আগুন লেগেছে। সবকিছু পুড়ে ছারখার। এক দুর্ভাগা মা দেখছেন তার সব সন্তানকে তিনি নিরাপদ আশ্রয়ে আনতে পারেননি। ছোট্ট এক সন্তান আটকে পড়ে। তাকে উদ্ধারের জন্য সে মরিয়া হয়। বিদ্যাসগর লিখছেন সে-আকুতির কথা– 'অপত্যস্নেহের এমনই মহিমা, সেই স্ত্রীলোক কোনও মতে স্থির হইতে না পারিয়া, শোকসংবরণপূর্বক পুনরায় সেই শিশুসন্তানের আনয়নের নিমিত্ত, জলন্ত গৃহের অভিমুখে ধাবমান হইল।'[২০]

আমাদের লোভ ও লাভের নেশা যে সমাজে কতো ক্ষতি করছে, তা বলে শেষ করা যাবে না। অর্থ-বিত্ত-খ্যাতির জন্য মানুষ মরিয়া হয়ে উঠেছে। কিন্তু আজও কেউ-না-কেউ আছেন, যে বা যারা লোভের উর্ধ্বে। নিজেকে সামলে রাখার এই যে শক্তি, তার মহিমা তুলে ধরেছেন ঈশ্বরচন্দ্র। এক বিপন্ন বৃদ্ধাকে কোনো দানশীল ব্যক্তি সাহায্য করতে চাইলে, তা প্রত্যাখ্যান করে সে নিজের নিস্পৃহতা আর মহত্বের পরিচয় দেয়। তার অভিব্যক্তি উদ্ধৃত করছি–

> কিন্তু আপনি যাহা দিতে চাহিতেছেন, তাহা আমার যত আবশ্যক, অনেকের তদপেক্ষা অনেক অধিক আবশ্যক। যদি আমি উহা লই, তাহাদিগকে বঞ্চনা করা হয়; আমার বিবেচনায় এরূপ লওয়া অতি গর্হিত কর্ম।[২১]

'বর্বরজাতির সৌজন্য' আখ্যানে দেখা যায় আমেরিকার এক আদিমবাসী মৃগয়ায় গিয়ে এক ইউরোপীয় ব্যক্তির বাড়ির সামনে হাজির হয়। তৃষ্ণা ও ক্ষুধায় তখন সে ক্লান্ত। লোকটি পানীয় ও খাদ্য চাইলে ইউরোপীয় 'সভ্য' লোকটি তাকে তিরস্কার করে এবং খাবার বা পানি না দিয়েই তাড়িয়ে দেয়। পরে, ঘটনাক্রমে সভ্য লোকটি আদিমবাসীর কাছে খাবারের সন্ধান করে। তখন সে তাকে আপ্যায়ন করে এবং বলে–

> মহাশয়, আমরা বহুকালের অসভ্য জাতি; আপনারা সভ্য জাতি বলিয়া অভিমান করিয়া থাকেন। কিন্তু দেখুন, সৌজন্য ও সদ্ব্যবহার অসভ্য জাতি সভ্য জাতি অপেক্ষা কত অংশে উৎকৃষ্ট।... যে অবস্থার লোক হউক না কেন, যখন ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হইয়া আপনকার আলয়ে উপস্থিত হইবে, তাহার যথোপযুক্ত আহারাদির ব্যবস্থা করিয়া দিবেন; তাহা না করিয়া তেমন অবস্থায়, অবমাননা পূর্ব্বক তাড়াইয়া দিবেন না।[২২]

– এই উপদেশবাণীর ভিতর দিয়ে লেখক আমেরিকা ও ইউরোপের মানুষের, তাদের সংস্কৃতির পার্থক্যই শুধু প্রকাশ করেননি; তিনি 'মানুষ' ধারণার এক বিরল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন। পরবর্তীকালে আধুনিকতার দ্বিতীয় পর্যায়ে কাজী নজরুল খাদ্য-সমতা নিশ্চিতকরণ এবং মানুষে মানুষের বিভেদের যে সংস্কৃতি ও রাজনীতি, তার প্রতি আমাদের সচেতন দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

দ্বিতীয় ভাগের মন্তব্য-প্রতিবেদনে স্থান পেয়েছে– 'দয়া ও দানশীলতা', 'যথার্থ পরোপকারিতা', 'মাতৃভক্তির পুরস্কার', 'অদ্ভুত আতিথেয়তা', 'দয়া ও সদ্বিবেচনা', 'সৌজন্য ও শিষ্টাচারের ফল', 'দয়া, সৌজন্য ও কৃতজ্ঞতা', 'অমায়িকতা ও উদারচিত্ততা', 'যথার্থবাদিতা ও অকুতোভয়', 'কৃতঘ্নতা', 'ধর্মশীলতার পুরস্কার', 'শঠতা ও দূরভিসন্ধির ফল', 'ঐশিক ব্যবস্থার বিশ্বাস', 'সংসারে নম্র হইয়া চলা উচিত', 'দোষ স্বীকারের ফল', 'নিরপেক্ষা ও ন্যায়পরায়নতা', 'যথার্থ বিচার', 'যেমন কর্ম তেমন ফল' প্রভৃতি শিরোনামের আখ্যান। আদর্শ মানব-চরিত্র গঠনে যা যা মানবীয় উপাদান দরকার, তার প্রায় সব কয়টি অন্তর্ভুক্ত হয়েছে এখানে। সংসারে শান্তি প্রতিষ্ঠিতার জন্য যে মানুষের সততা, নিষ্ঠা, পক্ষপাতহীন সামাজিক অবস্থান, সৃষ্টিকর্তার প্রতি অসীম আস্থা খুব প্রয়োজন, তা চোখে আঙুল দিয়ে বিদ্যাসাগর আমাদেরকে বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করে গেছেন। আজও তাঁর বিপুল সমাজবাদী রচনা আমাদেরকে পথ চলতে সহায়তা করে। বর্তমান প্রজন্ম, বিদ্যাসাগরের দেখানো আদর্শ শিক্ষা ও নৈতিক চিন্তা থেকে যতোই দূরে সরে পড়ছে, ততোই সমাজের জন্য অমঙ্গলের পথ সুগম হচ্ছে। পৃথিবী যেন এখন নীতিহীনদের, ঠগদের, ধর্মহীনদের অভয়ারণ্যে পরিণত হয়েছে। বিদ্যাসাগর জানেন, 'ধার্মিকেরা সুখী' আর 'সংসারে সুখ মিষ্টিকথায়'।

এই পর্বে 'ঐশিক ব্যবস্থার বিশ্বাস' আখ্যান-প্রবন্ধে আমরা দেখি এক এতিম বালক কোনো ডাক্তারের বাড়িতে পরিচারিকার কাজ নিতে গিয়েছিল। সে কার কাছে যেন শুনেছিল যে, তিনি লোক খুঁজছেন। কিন্তু ডাক্তার জানালেন– এই মুহূর্তে তার কাজের লোকের প্রয়োজন নেই। অবশ্য তিনি ছেলেটিকে নিরাশ না-হওয়ার জন্য পরামর্শ প্রদান করেন। তখন, বালকটি ডাক্তারকে তার অবস্থানের কথা জানায়। বালকের বক্তব্যে তার জীবনদর্শন যেমন প্রতিফলিত

হয়েছে, তেমনই পাশাপাশি আমরা পেয়েছি এক আশাময়, সম্ভাবনাময় সমাজের ইঙ্গিত। বালকের বিবৃতি–

> 'মহাশয়, যদিও আমি অশন বসন সর্ব বিষয়ে, অতিশয় ক্লেশ পাইতেছি, তথাপি একদিনের জন্যও হতোৎসাহ হই নাই, সম্পূর্ণ আশা আছে, আমি অচিরে কোনও স্থানে নিযুক্ত হইয়া আপনকার ক্লেশ দূর করিতে পারিব। দেখুন, এই পৃথিবী অতি প্রকাণ্ড স্থান। ঈশ্বর এই পৃথিবীর কোনও স্থানে অবশ্যই আমার জন্য কোনও ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছেন, এ বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস আছে।[২৩]

সত্যের জয় যে সুনিশ্চিত, সেই পুরনো কথা নতুন করে বলার চেষ্টা করেছেন বিদ্যাসাগর। 'দোষ স্বীকারের ফল' কলামটির ক্যানভাসে দেখা যায়, ফ্রান্সের এক রাজা গিয়েছেন জার্মানের এক কারাগার ভিজিট করতে। তো ভিজিটকালে অস্ত্রশালার তত্ত্বাবধায়ক রাজাকে অনুরোধ করেন যে, তার পছন্দ মতো কোনো এক কয়েদিকে মুক্ত করে দেবেন তিনি– এক্ষেত্রে রাজা স্বাধীন মতো তার পছন্দ ও মতামত জানাতে পারবেন। রাজা কারাগার পরিদর্শনকালে বিভিন্ন কয়েদির সাথে আলাপের ছলে জানতে চান– কেন সে কারাগারে। তখন একের পর এক কয়েদি বলতে থাকে– এই রাজ্যে কোনো ন্যায় বিচার নেই। বিনা কারণে তাকে আটকে রাখা হয়েছে। ভালো মানুষদের রাজ্য এটা না– ইত্যাদি ইত্যাদি। শেষমেশ রাজা একজনকে পেয়ে যান– যিনি নিজের দোষ স্বীকার করেন। তখন রাজা তত্ত্বাবধায়কের কাছে তার মুক্তির সুপারিশ করেন। ওই সত্যভাষী কয়েদির জবানবন্দি এখানে তুলে দিচ্ছি–

> আমি অতি দুষ্টস্বভাব ব্যক্তি; স্বভাবদোষে কত লোকের উপর কত অত্যাচার করিয়াছি, বলিতে পারি না। প্রকৃত কথা বলিতে গেলে, আমার মত দুরাত্মা আর নাই। পূর্বে আমি আমার দোষ বুঝিতে পারিতাম না; এখনে সবিশেষ অনুধাবন করিয়া বুঝিতে পারিয়াছি, আমার যেরূপ গুরুতর অপরাধ, সে বিবেচনায় আমি লঘুদণ্ড পাইয়াছি।[২৪]

এই গ্রন্থের তৃতীয় ভাগে স্থান পেয়েছে 'যথার্থ বদান্যতা', 'পতিপরায়ণতার একশেষ', 'দস্যু ও দিগ্বিজয়ী', 'নৃশংসতার চূড়ান্ত', 'চাতুরীর প্রতিফলন', 'স্বপ্নসঞ্চয়ন', 'সৌভ্রাত্র', 'আশ্চর্য দস্যুদমন', 'যতো ধর্মস্ততো জয়ঃ', 'অকৃত্রিম প্রণয়', পুরুষ জাতির নৃশংসতা' ইত্যাদি। আর কিছু শিরোনাম আছে, যা পূর্বের দুইটি ভাগে আছে। তবে, শিরোনাম প্রায় অভিন্ন হলেও উপাখ্যান কিন্তু আলাদা। এই অংশে সংসারে নারীর সামাজিক অবস্থান ও মর্যাদা, পুরুষতন্ত্র, ভালোবাসার মাহাত্ম্য, পারস্পারিক সম্প্রীতি, দস্যুবৃত্তি ও নৈরাজ্য, মানুষের নৃশংস রূপ– সবকিছুই তিনি তুলে ধরেছেন কাহিনি বা উপাখ্যানের মোড়কে। এগুলো ফিকশন আবার কোনো কোনো বিবেচনায় নন-ফিকশন।

আখ্যানমঞ্জরী একটি আদর্শ সমাজবিধান। বিদ্যাসাগর যে-সমাজে বসবাস করেন, তার রূপান্তরের জন্য দিনরাত চিন্তা করেছেন। কল্পনা ও পরিকল্পনা করেছেন– কীভাবে সমাজের অসঙ্গতিগুলো দূর করে, সামাজিকের অজ্ঞতা *ঠেলে* সরিয়ে একটা শান্তিময়, স্বস্তিকর সমাজ-কাঠামো নির্মাণ করা যায়। কাজেই, *আখ্যানমঞ্জরী*র রচয়িতা একজন সমাজবিজ্ঞানী। সমাজ ও সভ্যতা নির্মাণের সফল কারিগর।

উপসংহার

বর্তমান বাঙালি সমাজে নীতিশিক্ষার বড় অভাব। নীতিচর্চার প্রতিও আজকের প্রজন্মের আগ্রহ খুব বেশি পরিলক্ষিত হয় না। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের উল্লিখিত গ্রন্থ দুটি আদর্শ মানব জীবনের দিক-নির্দেশিকা বলে বিবেচিত হতে পারে। বিনয়, ইতিবাচক চিন্তা এবং সৎকর্মের মাধ্যমে সমাজকে সুন্দর করা সম্ভব– সেকথাই বলতে চেয়েছেন এইসব গ্রন্থের কাহিনি-বিবরণে ও মন্তব্য-ভাষ্যে। প্রাগ্রসর সমাজচিন্তক ঈশ্বরচন্দ্র আজকের প্রজন্মের কাছে অনেকাংশেই বিস্মৃতপ্রায় এক নাম। তবে, বর্তমানে বাঙালির জীবনচর্চা ও পঠন-পাঠনে তাঁর এই নির্দেশনা অনুসৃত হলে তা আদর্শ সমাজ ও কল্যাণ-রাষ্ট্র গঠনে অত্যন্ত সহায়ক হবে বলেই মনে হয়।

তথ্যসূচি:

---

১ স্বপনকুমার মণ্ডল, 'বিদ্যাসাগরের অন্তরালে ঈশ্বরচন্দ্র', *আনন্দবাজার পত্রিকা*, কলকাতা: ৮ ফেব্রুয়ারি ২০২০

২ ড. উত্তম কুমার মুখার্জি, প্রধান শিক্ষক, বীরসিংহ ভগবতী বিদ্যালয়, ২০০৪; সূত্র বিবিসি বাংলা, লিংক: https://www.bbc.com/bengali/news-50520242

৩ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, 'বিদ্যাসাগরচরিত', *চারিত্রপূজা*, *রবীন্দ্রসমগ্র* খণ্ড ২, বাংলাদেশ: পাঠক সমাবেশ, দ্বিতীয় মুদ্রণ ২০১৬ (প্রথম প্রকাশ: ২০১১), পৃ. ৭৬৮-৭৬৯

৪ মহাত্মা গান্ধী, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', *বিদ্যাসাগর স্মৃতি*, (বিশ্বনাথ দে সম্পাদিত), কলকাতা: সাহিত্যম্, ১৯৭৯, পৃ. ৩৩-৩৪

৫ হিন্দি বৈতালপচ্চীসির অনুবাদ এটি। 'বেতালপঞ্চবিংশতি অনুবাদ-প্রচেষ্টা-প্রসঙ্গে মনে হতে পারে এ গ্রন্থ তো সেই রবীন্দ্রনাথ-নিন্দিত বিজয়বসন্ত, গোলেবকাওলি প্রভৃতির সগোত্র। তাহলে বিদ্যাসাগর কেন এ গ্রন্থের লেখক হতে গেলেন? তাহলে কি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের তদানীন্তন অধ্যক্ষ জি. টি. মার্শালের নির্দেশের কাছে নিম্নসহকর্মীর নিরাপদ আত্মসমর্পণ? কিন্তু মূলের সঙ্গে মিলিয়ে পড়লে দেখা যাবে বিদ্যাসাগর মূলগ্রন্থের অন্তর্গত উগ্র আদিরসের বর্ণনাংশগুলিকে সযত্নে পরিহার করেছেন। মূল সংস্কৃতেও অনুরূপ বর্ণনা ছিল। কিন্তু তাই বলে যেহেতু দেব ভাষায় লিখিত অতএব গ্রহণযোগ্য, সংস্কৃত পণ্ডিত বিদ্যাসাগর এমন সরল সিদ্ধান্তকে শিরোধার্য করতে পারেননি। তাঁর অনন্যপরতন্ত্র সাহিত্যবিবেক তাঁকে সুরুচি ও সংযমের ঈপ্সিত পথে নিয়ে গেছে। অনুবাদে গোত্রান্তর ঘটেছে মূলগ্রন্থের। (পুলিন দাশ, 'বিদ্যাসাগর: সাহিত্যিক ও সাহিত্যবিবেক', *বিদ্যাসাগর স্মৃতি*, পূর্বোক্ত, পৃ. ২০৭)

৬ উইকিপিডিয়া। লিংক: https://bn.wikipedia.org/wiki/%E0%A6%88%E0%A6%B6%E0%A7%8D%E0%A6%AC%E0%A6%B0%E0%A6%9A%E0%A6%A8%E0%A7%8D%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%B0_%E0%A6%AC%E0%A6%BF%E0%A6%A6%E0%A7%8D%E0%A6%AF%E0%A6%BE%E0%A6%B8%E0%A6%BE%E0%A6%97%E0%A6%B0

৭ 'সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি: বিবিসি বাংলার জরিপে অষ্টম স্থানে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', বিবিসি বাংলা, লিংক : https://www.bbc.com/bengali/news-50520242

৮ মাইকেল মধুসূদন দত্ত, 'ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর', *চতুর্দ্দশপদী কবিতা*, *মধুসূদন রচনাবলী* (অখণ্ড সংস্করণ), কলকাতা: পাত্র'জ পাবলিকেশন, চতুর্থ প্রকাশ ১৯৯৫, পৃ. ৩২১

[৯] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *বেতাল পঞ্চবিংশতি*, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: তুলি-কলম, ৩য় সংস্করণ ১৯৯৭, পৃ. ৭
[১০] পূর্বোক্ত, পৃ. ৮
[১১] পূর্বোক্ত, পৃ. ৯
[১২] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৫
[১৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ১৮
[১৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ২৩
[১৫] পূর্বোক্ত, পৃ. ৩৬
[১৬] পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৭
[১৭] পূর্বোক্ত, পৃ. ৬৫
[১৮] ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর, *আখ্যানমঞ্জরী*, *বিদ্যাসাগর রচনাবলী*, প্রথম খণ্ড, কলকাতা: তুলি-কলম, ৩য় সংস্করণ ১৯৯৭, পৃ. ৫২০
[১৯] পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২১
[২০] পূর্বোক্ত, পৃ. ৫২৯
[২১] পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৩৫
[২২] পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৪৮
[২৩] পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫২
[২৪] পূর্বোক্ত, পৃ. ৫৫৮